দৈনিক সংবাদ

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

13

তারিখ 25 JUL 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

সময় বহিয়া যায়

গাছপাথর

ঢাকার কেন্দ্রীয় সাধারণ (পাবলিক) গ্রন্থাগারটি সম্পর্কে অনেক রকম অভিযোগ রয়েছে। তা থাকবেই, নিখুঁত এজগতে কোথায় কে কবে। বইয়ের অভাব, ধুলোর বাহুল্য, আসনের অপর্যাপ্ততা, বাতিগুলোর না জ্বলা, কর্মচারীদের উদাসীনতা-- এই রকমের তালিকা খুবই প্রত্যাশিত। সত্যি কথা বলতে কি। কিন্তু দুটি বিশেষ অভিযোগ চোখে পড়বার মতো। এক হলো এর টয়লেটগুলোর সবকটিই দুর্গন্ধে ভরপুর; আর দ্বিতীয়, এর অনেক বইয়ের পাতা অশ্লীল মন্তব্যে আকীর্ণ। পড়া যায় না। অস্বস্তি লাগে না শুনলে?

বইকে পয়ঃপ্রণালী হিসাবে ব্যবহার করা হবে এটা ঠিক প্রত্যাশিত নয়। ঢাকায় গণশৌচাগার তেমন নেই, গ্রন্থাগারেরও অভাব, কিন্তু তাই বলে গ্রন্থাগারকে শৌচাগারে পরিণত করা--এ কোনো আনন্দের খবর নয়। বইয়ের পাতায় শ্লীল-অশ্লীল মন্তব্য লেখার রেওয়াজ অবশ্য নতুন নয়। এ কাজ চলছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বইগুলো সম্বন্ধে ওই যে খবর, খোলামাত্রই মারাত্মক দুর্গন্ধ ও বড় ভয়ঙ্কর। বুঝতে কষ্ট হয় না যে, দেশে অশ্লীলতার পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটা নানা ক্ষেত্রে অহরহ দেখতে হয়। গ্রন্থাগারে গিয়ে বই খুললেই যদি অশ্লীলতা ধাওয়া করে আসে তবে কি এটা অনুমান করতে হবে যে, বেড়ে ওঠা অশ্লীলতা নির্গমনের পথ না পেয়ে বইয়ের পাতাকে পর্যন্ত ব্যবহার করছে। বেগ বুঝি নির্মম, যে কোনো আবেগের তুলনায়। ভদ্রতা, সৌজন্য, শ্লীলতা এসব এখন সত্যি সত্যি বিপন্ন। আমাদের এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ভূমিতে এক সময়ে বাঘ ও শুয়োরের ভীষণ উৎপাত ছিলো, তারা এখন গেছে, কিন্তু তাই বলে আমরা কি বিপদমুক্ত, কিম্বা অত্যন্ত উন্নত আগের তুলনায়? গ্রন্থাগারে তো অশিক্ষিতরা যায় না, সব শিক্ষিতেরও যাবার কথা নয় (গেলে স্থানের অভাবে মারাত্মক গোলযোগ দেখা দিতো), যায় কেবল গ্রন্থপ্রেমিকেরাই আর, তাদেরই এই আচরণ। ছিঃ! অবশ্যই দোষও দেওয়া যায় না, এতো জঞ্জাল লুকায় কোথায়? বহু পুরুষের সঞ্চয়।

না, অতীতকে আমরা মোটেই আদর্শায়িত করবো না, কিন্তু বর্তমানেও তো তেমন কিছু পাই না খুঁজে.. যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়া চলে। চতুর্দিকে অশ্লীলতা। গ্রন্থাগারেও তাই। কিন্তু বইয়ের পাতায় মন্তব্য করাকে কেবল যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা দিয়ে বিচার করা যথার্থ আমি কিন্তু তা মনে করি না। পেছনে রাগও রয়েছে। এতকাল আমরা অনুরাগের কথা খুব করে বলেছি, ইনিয়ে বলেছি, বিনিয়ে বলেছি, কিন্তু তারই তলে তলে মানুষের বিশুদ্ধ, টাটকা, তরতাজা দগদগে রাগ যে কেমন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে তার খবর রাখিনি। মানুষ এখন ভয়ঙ্কর ক্ষ্যাপা। রাষ্ট্রপতিরা পর্যন্ত খুন হয়ে গেছেন, সাধারণ মানুষ কোন ছার। পরমতসহিষ্ণুতা কোথায় পাওয়া যাবে ঠিক জানা যায় না, বাস্তবে দেখা যায় কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না, চীৎকার করছে, গালি দিচ্ছে খুন পর্যন্ত করে ফেলছে। দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আমরা সবাই চাই, কিন্তু ক্রুদ্ধ মানুষদের দেশে গণতন্ত্রের পথ সহজ হবার কথা নয়, হচ্ছেও না। বইয়ের পাতায় অশ্লীল মন্তব্য করা ওই রাগেরই এক ধরনের প্রকাশ বলে আমার ধারণা। পারিলে বউ পেটায়, তা আর বই।

আরেকটা ব্যাপারও আছে। সেটা এই যে, আমার পরেই সব শেষ। আর নেই। কিছু নেই। থাকলেও তার দাম নেই কানাকড়ি। বইটি পড়লাম, এর পরে যে পাঠক আসবে সে এই বই পড়বে না, আমার মন্তব্যগুলো পড়বে। পড়ে বই বন্ধ করে পালিয়ে বাঁচবে। আর এই সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটছে রাস্তার লোক নয়, শিক্ষিত লোকদের হাত দিয়েই। বাংলাদেশে সাম্য নেই, আবার আছেও। অধিকারের সাম্য নেই, তবে রুচির সাম্য রয়েছে। অর্থাৎ রুচি বিকৃতির।

অতীতের কথা বলছিলাম। অনেকেই আছেন যারা আমাদের অতীত ঘেঁটে উজ্জ্বল কিছু পান না এবং পাবেন না আশংকায় ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান না। বড় দুঃখ পান। তাই বলে কিছুই যে নেই একথা তাদেরই সাজে যারা জন্মঅবিশ্বাসী, নইলে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, হাতের কাজে নিশ্চয়ই কাজ কিছু কিছু ছিল বলে মানতেন তাঁরা। স্থাপত্যের নিদর্শনও পাওয়া গেছে বৈকি। এককালে রেশমী ও সুতার কাপড়ের জন্য নাম ছিল আমাদের। আমরা জাহাজ পর্যন্ত তৈরী করেছি বলে উল্লেখ আছে। প্রাচীন কালের নগরগুলোও নিশ্চয়ই অন্যেরা এসে বানিয়ে দিয়ে যায়নি। আর ছিলো, এখনও আছে, মানুষের শ্রমশীলতা। মানুষ শ্রম করেছে, শ্রমের ভেতর দিয়ে উৎপাদন করেছে। আর করেছে বিদ্রোহ। এখনও করে। শ্রম ও বিদ্রোহের এই দুই সত্যকেও গৌরবের বিষয় বলে মানা যাবে। মানতে চাইলে। তবে স্বীকার করতে অনীহা থাকা উচিত নয় যে, আমাদের অতীতকে অতি উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত একটি গ্রন্থ যে বলবো তার কোনো উপায় নেই; বেচারা মোটামুটি ম্রিয়মাণ। আমাদের মতোই।

হালে বরঞ্চ কিছু কিছু উন্নতি ও অগ্রগতির চিহ্ন চারদিকে দেখা যাচ্ছে। একেবারেই হাল আমলে। এই যে এই ঢাকা শহর আমাদের, সাতচল্লিশে তার কি দশা ছিলো? আর কি অবস্থা তার আজ? সাতচল্লিশে ধুলো, ঘোড়ার গাড়ি ও ঢাকাই রসিকতা ছাড়া আর বিশেষ কিছু তো উল্লেখ করার মতো ছিলোনা এই রাজধানীতে। সেই তুলনায় আজ কেবল উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে নয়, আকাশের দিকেও উঠে গেছে সে, একটেরে। এই বিকাশ মূলতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশেরই ইতিহাস। দুই দুইবার স্বাধীনতা এলো, এসে মধ্যবিত্তকে শক্তিশালী হবার সুযোগ করে দিয়ে গেলো। (গরীবের কথা আলাদা)। কেউ কেউ আছেন, যাঁরা বলেন, এটা একটা শুভ ঘটনা, কেননা এখান থেকে, এই শ্রেণীর বসবাসের দালান-কোঠা থেকেই যোগ্য নেতৃত্ব বের হয়ে আসবে আমাদের জন্য। কেবল আন্তরিকতায় কুলায় না, যোগ্যতাও চাই, আর সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হচ্ছে আর্থিক যোগ্যতা, যেটি না থাকলে সমস্ত কিছু ব্যর্থ, হয়তো বা বিড়ম্বনাই। তাই আশা করা যায়, ঢাকা শহরে আজ যারা অবস্থাপন্ন লোক তাঁরা নিজেরা না পারুন, তাঁদের সন্তানেরা, কিম্বা সন্তানদের সন্তানেরা পারবে নেতৃত্বের অভাব পূরণ করতে। নেতৃত্ব তো আর আকাশে ভাসে না, ঘরেই থাকে, তার পায়ের নীচে মাটি চাই। মাথার ওপর ছাদ, তা নইলে কিসের নেতৃত্বে কিসের কি? যার ছাত্রজীবন কেটেছে অন্যের বাড়িতে জায়গীর থেকে, পরবর্তী জীবনে তিনি যতই যোগ্য কিম্বা বিজ্ঞ হোন না কেন, ওই যে এককালে তার পরনির্ভরতা ছিলো সেই হীনম্মন্যতার গোপন অভিশাপ থেকে তাঁর মুক্তি নেই। তিনি স্বাচ্ছন্দ্য নন, স্বাভাবিক নন, সহজ নন। তিনি কি করে যোগ্যতার পরিচয় দেবেন, নেতা হিসাবে? নেতৃত্বের ভিত্ সবেমাত্র তৈরী হয়েছে। কথায় বলে হিন্দুর বাড়ি, মুসলমানের হাঁড়ি, খৃষ্টানের গাড়ি; এই প্রথম-বাংলায় মুসলমান বাড়ি করেছে, গাড়ী করেছে, হাঁড়িও ভাল করে নিয়েছে। তাই নেতৃত্ব এখন আশা করা যায়, আগে যা আশা করা যায়নি। --এই মত কেউ কেউ ধারণ করেন।

বলা বাহুল্য, একে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না, বরঞ্চ মানতেই হবে যে, এই বক্তব্যে যুক্তি রয়েছে। আপনি অবশ্যই বলতে পারেন যে, এ বক্তব্য হচ্ছে লুন্ঠনের অজুহাত। বাংলাদেশে এখন যা চলছে তা হচ্ছে পুঁজির আদিম একত্রকরণ, আর সেই প্রক্রিয়ার পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থন আদায়ের জন্য এ ধরনের যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে, এবং তা করছেন তাঁরাই যাঁরা ওই প্রক্রিয়ায় সুবিধাভোগী। এ কথা আপনি বলতে পারেন, আর সে বলার পেছনে যে যুক্তি থাকবে না তাও নয়। থাকবে। তবে যার চাল নেই, চুলো নেই, সে কি করে নেতৃত্ব দেবে এটাও ভাববার বিষয় বটে। না এমন দাবী কেউ করবেন না যে, ধনী ঘরে সন্তান হলেই নেতৃত্ব দিতে পারবেন, কিম্বা চাইবেন। দশজনের নয়জনই হয়তো অন্যপথে যাবেন, কিন্তু একজনও যদি আসেন জনগণের দিকে এগিয়ে, তবে ঘটনা হিসাবে সেটা কম কিসে? ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখুন, পাকিস্তানের দিকেও তাকান, কারা নেতা? অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তানরা নয় কি? অবস্থাপন্নরাই পারে, কেননা তাঁদের আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে, তাঁরা সহজে বিক্রি হন না, শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চান। অতএব--।

যুক্তি খারাপ নয়, কিন্তু মুস্কিল আছে। প্রথম মুস্কিল এই যে, অবস্থাপন্নরা অবস্থাপন্ন হচ্ছে বলেই দুর্দশাগ্রস্তরা আরো বেশি দুর্দশায় পড়ছে। একেবারে সহজ হিসাব, এ যত বাড়বে, ও তত নামবে। তাহলে? দ্বিতীয় মুস্কিল এই যে, কবে এই নতুন নেতৃত্ব আসিবে, এসে আমাদেরকে মুক্ত করবে তার জন্য যদি প্রতীক্ষা করে বসে থাকি বিপজ্জনক এই নদীর ধারে তাহলে নিশ্চিহ্ন হবার যোলআনা সম্ভাবনা। তা থেকেই বা কে আমাদেরকে বাঁচাবে?

শ্রেণী হিসাবে ধনীরা বিপ্লবী হবেন, এ আশা বৃথা, তাঁরা বিপ্লবী হয়েছেন এমন নজির ইতিহাসে নেই। তাঁরা চাইবেন আরো ধনী হতে, অর্থাৎ গরীবকে আরো বেশি গরীব করে ফেলতে। তবে? হ্যাঁ কেউ কেউ যেতে পারেন বৈকি গরীবের দিকে। নিয়ম হিসেবে নয়, ব্যতিক্রম হিসেবেই, তাও যেতে হলে শ্রেণীচ্যুত হয়ে যেতে হবে, নইলে গরীবের কোনো লাভ নেই, ক্ষতি ছাড়া। ভারতে নক্সালবাড়ি আন্দোলনের ঐতিহাসিক ব্যর্থতার অনেক ক'টি কারণ রয়েছে, তার একটি কারণ অবশ্যই এই যে, শহরে, অবস্থাপন্ন ঘরের বিপ্লবী তরুণেরা পাউরুটি-মাখন, এমনকি টুথপেষ্ট পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু শ্রেণীগত গোপন অহমিকা ও সূক্ষ্ম আত্মসচেতনতাটা পরিহার করতে পারেননি। সে খুব কঠিন কাজ।

আর ক্রয়বিক্রয়? আত্মসম্মানজ্ঞান? তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? বরঞ্চ এটাইতো দেখি আজ যে, আত্মসম্মান বিক্রয় করে কিম্বা একেবারে বিসর্জন দিয়ে তবেই ধনী হতে হয়, অন্য পথ থাকতে পারে, কিন্তু তা ভীষণ দুর্গম। এ কথা তাই বলবার কোন উপায় নেই যে, ধনীদের কেনা যাবে না; উল্টোটাই বরঞ্চ ঘটার সমূহ সম্ভাবনা। দেখা যাবে ক্রেতা কম, বিক্রেতা বেশি-- এবারের চোরাবালীর হাটে যেমনটি ঘটেছিল। (হেমেন্দ্রনাথ দালালের হাট থেকে সন্ধ্যায় গাড়ীতে পথ সন্ধান করতে করতে এক লোক বললো আমায়, 'সারাটা দিন বসে রইলাম, একজনও জিজ্ঞেস করলো না, তুমি ওই দুটো কি এনেছ, গরু না ছাগল, জ্যান্ত না মরা?') এক পুরুষে যা না হয় তা সাত পুরুষে হবে এমন ভরসাও কম।

বিত্তবানদের বিত্তবান হওয়ার ভালো দিকটির পক্ষে ওই বক্তব্যটির প্রসঙ্গে মনে পড়ল আমার যে, অবিকল ওই যুক্তিই তো ছিলো উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত বঙ্গীয় রেনেসান্সের পক্ষে। অসামান্য এক শহর গড়ে উঠেছিল কলকাতায়, আর সেই শহর সাহিত্য বলি, শিক্ষা বলি, সংস্কৃতি বলি সকল ক্ষেত্রেই অসামান্য রকমের ভালো কাজ করেছিল। তা করেছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে কি বাঙলার দারিদ্র্য ঘুচেছে কিম্বা প্রকৃত অর্থে ওই ভূমি উন্নত হয়েছে? দেশ ছিলো কৃষকের, ওইসব অসামান্য তৎপরতার জোয়ালের নীচে পড়ে সেই কৃষকের হাল তার হালের গরুটির চাইতে উন্নত হয়নি। বড়রা বড় হয়েছেন, ছোটদেরকে আরো ছোট করে। সংস্কৃতির ওই আপাত অগ্রগতি বিপুল সংখ্যক মানুষের দুর্দশা ও দুর্গতির ক্ষতিপূরণ নয়। কিছুতেই না। এর আলো ওর গায়ে চুয়ে পড়েনি, বরঞ্চ ওর অন্ধকারকেই আরো স্পষ্ট করে তুলেছে।

তবু মানতেই হবে যে, ওইকালের মানুষদের মনে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য এক ধরনের আকুতি ছিলো। এখনকার ধনীদের মধ্যে সেটুকুরও বড় অভাব। সব মিলিয়ে, বিত্তবানদের নেতৃত্বে আস্থা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, প্রতীক্ষা করে বসে থাকা তো রীতিমত বিপজ্জনকই।

নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার দরকার পড়বে। অবশ্যই অনেক দিন পরে সেদিন একটা ভালো খবর পড়লাম দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অল্প করে হলেও কমেছে, যার ফলে বর্তমান জনসংখ্যা আগামী ৩০ বছরে দ্বিগুণ হবে এমন আশংকা নেই, ৩২ বছর লাগবে, অবশ্য বৃদ্ধির হার যদি আরও কমিয়ে আনা যায় তবে সময় লাগবে আরো বেশি। ভালো খবর। ভালো খবর ওটিও যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু তারপরেই দেখি নিষেধাজ্ঞা। প্রাথমিক স্তরে বেড়েছে, কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রের শতকরা হার কমে গেছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে কি পড়া হয় না হয় তা আমরা সব সময়ে বুঝতে পারি না ঠিকই, কিন্তু শেষ পরীক্ষায় খুব যে নকল হয় তা না বুঝে উপায় থাকে না। খবরের কাগজগুলো চীৎকার করে বলে সে খবর। সেই মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা যদি কমে যায় তবে উন্নতির ব্যাপারে আশাবাদী হই কি করে? আর বিশ্ববিদ্যালয়? তার কথা কি বলি। পাকিস্তান কোনো আদর্শ রাষ্ট্র নয়; সেখানেও শুনলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ঊনত্রিশটিতে দাঁড়িয়েছে, আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যায় বাড়বে কি, চালুই থাকতে চায় না। এবং সবশেষে থাকে এই সত্য যে, শিক্ষিত লোকেরা গ্রন্থাগারে গেলে (অল্পই যায়) বইয়ের গায়ে অশ্লীল মন্তব্য লিখে রেখে আসে। জনগণের নেতৃত্ব এখান থেকে আসবে বলে আস্থা রাখতে পারি না। আমরা সুযোগপ্রাপ্তরা একে অপরকে আর কি দেখাবো নিজ নিজ অশ্লীলতা ছাড়া? সুযোগ যত বেশি প্রদর্শনী তত বড়। ঝাড়ুদারের বড় অভাব।

আসলে জনগণের মুক্তির ব্যবস্থা জনগণকেই করে নিতে হবে। অন্য কেউ করে দেবে না।